প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনো পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2011

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ইতিহাস **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম : পর্যায়

PG History 7B : 1

(PGHI)

		রচনা	সম্পাদনা
একক	1	ডঃ রূপকুমার বর্মন	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার
একক	2	—	—
একক	3	—	—
একক	4	—	—

ঘোষণা

এই পাঠসংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিবন্ধক

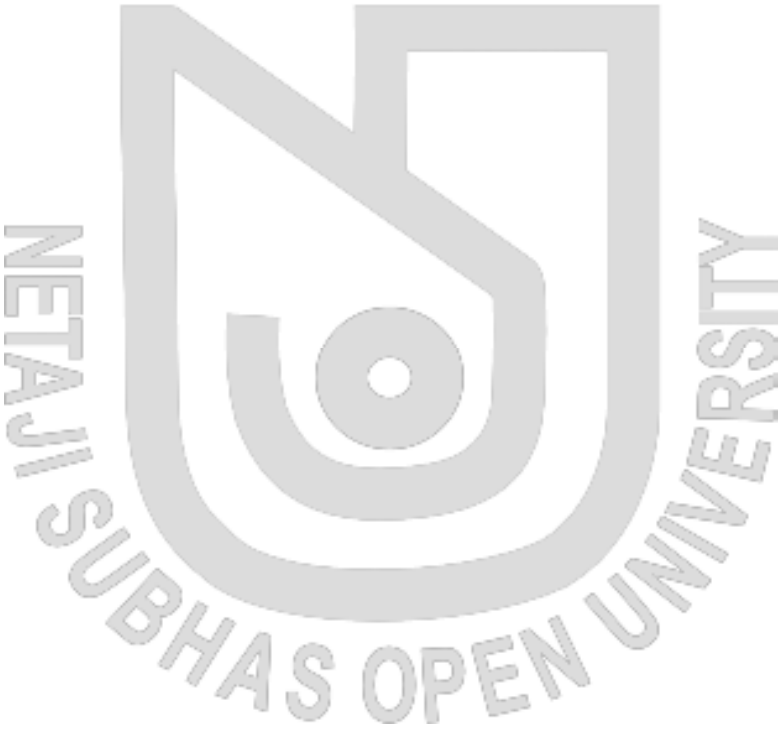
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG History 7(B)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

(PGHI)

পর্যায়

1

একক 1	সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো : বিবর্তন ও সমস্যা	7
একক 2	সুলতানি ব্যবস্থার তত্ত্ব ও স্বরূপ : সুলতানি, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা	13
একক 3	কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ	18
একক 4	রাষ্ট্র ও সমাজ	27

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক-১ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ঃ বিবর্তন ও সমস্যা।

গঠন

১.০. ভূমিকা
১.১. আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশ
১.২. রাজনৈতিক বিবর্তনের চরিত্র
১.৩. সামাজিক বিবর্তনের ধারা
১.৪. গ্রন্থপঞ্জি
১.৫. অনুশীলনী

১.০. ভূমিকা

খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়। একদিকে শক্তিশালী ও সংগঠিত সাম্রাজ্যরাষ্ট্রের (Empire State System) অবক্ষয় ও অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিস্তার এবং রাজনৈতিক অন্তঃকলহ ভারতের রাজনীতিতে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত নতুন শাসকগোষ্ঠীর হাতে স্থানান্তরিত হয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ। এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে শুরু হয় সুলতানি শাসন, যা চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ ভারতের ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সমাজ-কাঠামোর (Structure of the society) পরিবর্তন। সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন। গুপ্ত ও গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি আবর্তিত হতে থাকে যেখানে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক ও মূল উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক হয়ে পড়ে সামন্ততান্ত্রিক। পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয় চতুর্থ শতক থেকে। ফলে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন সামন্তপ্রভুগণ। রাজনৈতিক কাঠামোর এই পরিবর্তনের সঙ্গে চলতে থাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতির চরিত্রগত পরিবর্তন।

১.১. আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশ

গুপ্ত সাম্রাজের অবক্ষয়ের সময় অর্থাৎ পঞ্চম শতক থেকে ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার (State System) বিবর্তনের ইতিহাসে যে ধারার সৃষ্টি হয়, তা ছিল মূলত বিকেন্দ্রীভূত (Decentralised)।

এটা ছিল আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশের সহায়ক। স্বাভাবিকভাবেই গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটে অতি দ্রুত।

পরাক্রমশালী গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭) হূন আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেও তার মৃত্যুর পর হূননেতা তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হূনদের রাজ্য গড়ে ওঠে ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত হূন রাজ্যের মূল ভিত্তি ছিল অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ। ফলে এদের রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হূনদের সমসাময়িক মৈত্রকগণ বলভী (গুজরাট)-তে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এদের উত্থান ঘটেছিল সামন্তপ্রভুর পর্যায় থেকে। মৈত্রক রাজ্য শিলাদিত্য (৬০৬-৬১১) বলভীর শক্তিবৃদ্ধির যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সপ্তম শতকের গোড়ায় তা অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত টিকেছিল। মৈত্রকদের মতই মৌখরীগণ সামন্তশক্তিকে রাজশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। একইভাবে মন্দাশোরে প্রতিষ্ঠিত হয় যশোধর্মনের রাজ্য (৫৩০-৫০)। পাশাপাশি মালবের সামন্ত শাসকগণও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ষষ্ঠ শতকের গোড়ায়। এই রাজ্যগুলির প্রধান দুর্বলতা ছিল পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিগ্রহ।

ষষ্ঠ শতকের শেষ দশক ও সপ্তম শতকের গোড়ায় উত্তর ভারতের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যের বিস্তার ঘটে। থানেশ্বর-এর মৌখরীগণ প্রভাকর বর্ধন (৫৮০-৬০৫)-এর নেতৃত্বে হূন মালবের রাজাদের পরাজিত করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হর্ষবর্ধন (৬০৬-৪৭) আত্মীয়তার সূত্রে প্রাপ্ত কনৌজ-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার নেতৃত্বে কনৌজ হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক গৌড় (বাংলা) ও কামরূপ (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা নিম্ন অসম ও হিমালয়-সংলগ্ন বাংলা) উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তির আকাশে আবির্ভূত হয়। গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক তার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে হর্ষবর্ধনের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল দখল করতে আগ্রহী হন। অন্যদিকে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে দমন করতে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের (৬০০-৬৫০) সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মনের মিলিত চাপে শশাঙ্ক পরাজিত হন। তার মৃত্যুর পর (৬৩৭) বাংলায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ভাস্করবর্মনের কামরূপ উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরিণত হয়। হর্ষবর্ধনের কনৌজ হয়ে ওঠে রাজনীতির মূল কেন্দ্র। তবে এই শক্তিব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শশাঙ্ক, ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র নৃপতিগণের বিশেষ করে সামন্তরাজাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সপ্তম শতকের শেষভাগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজপুত, গুর্জর, প্রতিহার ও কাশ্মীরের উত্থান ঘটে।

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীনকালের চোল, পাণ্ড্য ও চেরা শক্তি চতুর্থ শতকের পর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উপস্থিত না-থাকলেও খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে পল্লবগণ এক শক্তিশালী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৩০) প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৮) শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেরই রাজ্যবিস্তার

করে ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁরা সিংহল বিজয়ের জন্যও সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। শিল্প-স্থাপত্য, ধর্ম-সাহিত্য ও কৃষির বিস্তারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাতাপির চালুক্যশক্তি। সাতবাহন-বাকাটকদের উত্তরাধিকারী চালুক্যগণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের প্রথম পুলকেশি (৫৩৫-৬৬) ও দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২) পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এমনকী সমকালীন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬৩৪)। এরপর তিনি 'পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। তবে চালুক্যদের এই শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অষ্টম শতকে তবে চালুক্যগণ তাদেরই সামন্ত রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা উৎখাত হন।

অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে ভারতে আবার কয়েকটি সাম্রাজ্যতুল্য (Empire type) শক্তির বিকাশ ঘটে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে। এই সময় কনৌজকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতের পাল সাম্রাজ্য, পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব (Tripartite Struggle) শুরু হয়। পালরাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০), প্রতিহাররাজ নাগভট্ট (৮০০-৮২৫) ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ দখল করার জন্য যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিলেন, তাতে কোনো পক্ষই চূড়ান্ত সফলতা পায়নি।

এখানে বলা দরকার যে, এই তিনটি শক্তির সূচনা হয়েছিল অতি নগণ্য সামন্ত শাসকের ভিত্তি থেকে। বাংলায় পালবংশের সূচনা করেছিলেন গোপাল (৭৫০-৭৭০), যিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ও সামন্ত শাসক। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের মৃত্যুর পর দেবপাল (৮১০-৫০), মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) ও রামপাল (১০৭৭-১১৩০) বাংলায় পালদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

অন্যদিকে, গুর্জর-প্রতিহারগণ মিহিরভোজ (৮৩৬-৮৫), প্রথম মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০) ও মহীপাল (৯১২-৯৪৪)-এর নেতৃত্ব পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শক্তিবিস্তার করেছিলেন। পালদের মতোই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ তাদের রাজ্যগঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন সামন্তপ্রভুর অবস্থান থেকে। এই বংশের প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮-৭৭৩), ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩), তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪), অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৮) ও তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৪০-৬৮) রাষ্ট্রকূট শক্তির বিস্তার করেছিলেন। দশম শতকের শেষদিকে এর অবসান ঘটে।

তবে দশম-একাদশ শতকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল দক্ষিণ ভারতের চোল সাম্রাজ্য। প্রাচীন চোল রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে বিজয়ালয়ের হাত ধরে। প্রথম আদিত্য (৮৮০-৯০৭), প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৪) অপেক্ষাকৃত ছোটো রাজ্যের শাসক হলেও প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪) ও প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-১০৪০) চোলদের শক্তি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এমনকী সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযানের দ্বারা সাম্রাজ্যবিস্তারে চেষ্টা করেন এরা।

একাদশ শতকের শেষদিকে ও দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতে কোনো শক্তিশালী রাজ্য না থাকার জন্য তুর্কিদের পক্ষে ভারতে রাজ্যবিস্তার সহজ হয়েছিল। দশম শতকের শেষদিকে গজনির সুলতান সবুক্তগীন ভারত আক্রমণের সূচনা করেন, যা সুলতান মামুদ পরপর চালিয়ে যান (১০০০-২৭)। তবে এরা কেউই রাজ্যবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না। তবে মহম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) জয়লাভ করে ভারতে সুলতানির শাসনের সূচনা ঘটান। মহম্মদ ঘুরী বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব তার অনুচর কতুবউদ্দিনের হাতে সমর্পন করে দেশে ফিরে যান। কুতুবউদ্দিন সামরিক অভিযান চালিয়ে উত্তর ভারতে তুর্কিদের আধিপত্য বিস্তার করেন। অন্যদিকে, বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করে সেখানে মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহম্মদ ঘুরীর মৃতুর পর কতুবউদ্দিন দিল্লির সুলতান হন (১২০৬-১০)। এই সুলতানি রাজ্য ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সুযোগ্য নেতৃত্বে এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১.২. রাজনৈতিক বিবর্তনের চরিত্র

খিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতে যে সমস্ত রাজ্য বা সাম্রাজ্যতুল্য শক্তির উত্থান ও বিকাশ ঘটেছিল তাদের গঠন প্রক্রিয়ার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। রাষ্ট্র ও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐতিহাসিকগণ এই সময়কার রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহের উত্থানকে মূলত বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বর্ধিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় একদল ঐতিহাসিকের মধ্যে। বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের প্রক্রিয়া। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আদলে সৃষ্ট ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (Indian Feudalism) ধারণাটির প্রবক্তাদের মতে, সমাজ ও অর্থনীতি সামন্ততান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণ (Feudalisation of society and economy)-এর ফলে পূর্বতন কেন্দ্রীভূত রাজ্যসমূহ থেকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের দ্বারা শাসনতান্ত্রিক অধিকারসহ ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে। আমরা লক্ষ করেছি যে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতের অনেকগুলি শক্তিশালী রাজ্যের আদিপুরুষগণ ছিলেন সামন্তশাসক। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল প্রচারক D.D. Koshambi (An Introduction to the study of Indian History) ও রামশরণ শর্মা (Indian Feudalism 1965) এবং তাদের অনুসরণকারীদের এই ধারণাটি সমালোচিত হলেও পুরোমাত্রায় অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি কেউই।

তবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে (অর্থাৎ পল্লব পাণ্ড্য) বিশেষ করে চোল সাম্রাজ্যকে সামন্ততন্ত্রের বাইরে অন্য একটি অভারতীয় সমাজরাষ্ট্রের আদলে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ করা

যায় বিংশ শতকের শেষ সিকিভাগে। আফ্রিকীয় সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে তৈরি কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্য (Segmentary State) ধারণাটির প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। এই ধারণার প্রবক্তা বিশেষ করে Burton Stein (Peasant State and Society 1980) ও R.G. Fox (Kin, Clan, Raja and Rule, 1971)-এর মতে, পল্লব, চোল ও পরবর্তীকালের বিজয়নগর সাম্রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকার সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ভোগ করলেও বিভিন্ন ভূ-অঞ্চলে অবস্থিত কৃষক অঞ্চল (Peasant region) বা প্রত্যন্ত অঞ্চল (Peripheral zone)-গুলো ছিল মূলত স্বয়ংশাসিত। কেন্দ্রীয়ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত মধ্যবর্তী অঞ্চল (Middle zone)। তবে এই কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের প্রকল্প দক্ষিণ ভারতের আদি মধ্যযুগীয় বা মধযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

১.৩. সামাজিক বিবর্তনের ধারা

আদি মধ্যযুগের সমাজ গঠন ও বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি (dynamics) নিহিত ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে। রাষ্ট্রব্যবস্থার সামন্তিকীকরণ বা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের বিকাশ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার যে পরিবর্তন এনেছিল, তার ফলে গুপ্ত ও গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণির বা বর্ণের অবস্থানগত বিন্যাসের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রভূত পরিমাণে ভূমিদান করার ফলে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে কৃষি উৎপাদনে বেশি উৎসাহিত হয়। সামন্তরাজ বা আঞ্চলিক রাজাদের দ্বারা ভূমিদান হিসাবে দেওয়া গ্রামগুলিতে দানগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে দেয়। কৃষিকাজের মূল উৎপাদনগুলির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ভূমিদান গ্রহীতা (ব্রাহ্মণ, বল্লাল, মান্দ-মর্ত ইত্যাদি)-দের হাতে। অন্যদিকে, কৃষকরা হয়ে ওঠেন আজ্ঞাধীন কৃষিশ্রমিক (Servile agricultural labour)। এমনকী তারা বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম (ভিস্তি)-দানেও বাধ্য থাকতেন। সেচব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেগার শ্রমদানের প্রথা চালু হলেও ধীরে ধীরে তা মন্দির বা রাজপ্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

ব্যাবসাবাণিজ্যের অবক্ষয়ের ফলে বণিকশ্রেণি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়. এবং বণিক ও কারিগর শ্রেণিও কৃষিকাজে ভিড় করে। তবে কৃষিক্ষেত্রে ভূমি-নিয়ন্ত্রকদের অতিরিক্ত কঠোর মনোভাব কৃষিপণ্যের প্রকৃত উৎপাদকদের বিক্ষুব্ধ করত মাঝে মাঝে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উৎপাদক উৎপাদন-নিয়ন্ত্রকদের সম্পর্ক পরিবর্তনের ফলে ভারতের চিরাচরিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতিব্যবস্থার বিভিন্ন জাতির (casts) অবস্থানগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় বিভিন্ন মিশ্রজাতিসমূহের সৃষ্টি হয়। মিশ্রজাতির মধ্যে কায়স্থরা শিক্ষিত শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষত্রিয়

জাতির দ্বারা রাজ্যগঠনের ফলে তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়করণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ফলে ক্ষত্রিয়জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে অসম, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য জাতিব্যবস্থা (Brahmical caste system)-বহির্ভূত অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতির বিকাশের ফলে সেখানকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি (social class) জাতিব্যবস্থার (caste system) সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন জাতি হিসাবে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে।

১.৪. গ্রন্থপঞ্জি

১. R. K. Barman : From Tribalism to State (Delhi, 2007).
২. J. S. Grewal (ed) : State and Society in Medieval India (New Delhi, 2005).
৩. R. S. Sharma : Early Medieval Indian Society (Calcutta, 2001).
৪. Burton Stein : Peasant State and Society in Medieval South India (Delhi, 1980).
৫. D. D. Koshambi : An Introduction to the study of Indian History (Bombay, 1956).
৬. Romila Thapar (ed) : Recent Perspectives on Early Indian History (Mumbai, 2002).

১.৫. অনুশীলনী

১. খিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিকশিত রাজ্যসমূহের বিবরণ দিন।
২. আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরিত্র কী ছিল?
৩. আদি মধ্যযুগে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের চালিকাশক্তি কী ছিল?

একক-২ সুলতানি ব্যবস্থার তত্ত্ব ও স্বরূপ : সুলতানি, খলিফা ও সুলতানীর বৈধতা

গঠন

২.০. প্রস্তাবনা
২.১. সুলতানির স্বরূপ
২.২. সুলতান, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা
২.৩. গ্রন্থপঞ্জি
২.৪. অনুশীলনী

২.০. প্রস্তাবনা

ভারতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা নিসঃন্দেহ একটি নতুন রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু একে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কৃতিত্ব ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬)। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানিকে মুসলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের মানচিত্রে উদ্‌ভাসিত করেন। তার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে দিল্লি সুলতানি অপেক্ষাকৃত হীনবল হলেও বলবন (১২৬৫-৮৭) একে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির সুলতানি শাসনকে দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে দেন। তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক একে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

২.১. সুলতানির স্বরূপ

ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত দিল্লি-সুলতানির স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। সাধারণভাবে দিল্লি সুলতানিকে দিব্যতন্ত্রের (Theocracy) সঙ্গে তুলনা করা হয়। দিব্যতন্ত্র হল— a form of government in which God (or a diety) is recognised as the king or immediate ruler., and his laws are taken as the statiute book of the kingdom, these laws being usually administered by a priestly order as his minister are agents (Shorter Oxford Dictionary). তাই ইসলামিক রাষ্ট্রে আল্লাহ (ইশ্বর)-কে সর্বশক্তিমান শাসক মনে করা হয়, যার মুখনিঃসৃত বাণী বা **কোরান** হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের আইন। ইসলামিক আইনের মূল উৎস হচ্ছে **সারা** (Shara), যা হজরত মহম্মদস্ব-এর মধ্যে দিয়ে মুসলমানগণের কাছে পৌঁছেছে। *সারা*

পরিবর্তনযোগ্য নয়। এমনকি মহম্মদের *সারা* পরিবতর্নের অধিকার ছিল না। তিনি কেবলমাত্র *সারার* ব্যাখ্যা করেছেন, যা *হাদিস* নামে পরিচিত। এই *সারা* ও *হাদিস* হচ্ছে ইসলামিক দিব্যতন্ত্রের মূল আধার।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আদর্শ ইসলামিক সমাজব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে কোরান বা হাদিস-নির্দেশিত আইনগুলি যথেষ্ট নয়। তাই মহম্মদ ও তার উত্তরসুরি খলিফা (উমর, সৈমান এবং আলি)-দের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে মুসলমান রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে পারস্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেক বেশি সাযুয্যপূর্ণ তাই ইসলামিক ব্যবস্থায় 'সুলতান' (রাজা) নামক প্রতিষ্ঠানটি গৃহীত হল ইসলামের দ্রুত বিস্তারের জন্য, যা মহম্মদ নিজে কখনোই প্রচার করেননি। সুলতান নিজেও ইসলাম-বিচ্যুত জীবন যাপনের কালিমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই সুলতানের কার্যাবলিকে বৈধতাদানের জন্য সৃষ্টি হল 'উলেমা' নামের আর একটি প্রতিষ্ঠানের। উলেমাগণ সুলতানের রাজনৈতিক কার্যাবলির ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতেন। উলেমাগণ মনে করতেন যে, সুলতানের দ্বারা ইসলামের শত্রুকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম কখনোই পুরোহিততন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, উলেমাগণ ইসলাম ও আল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে শাসকের প্রেরণাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বারবার। তাই উলেমাগণ ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার ও অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন।

উলেমাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ও দিল্লিতে স্থাপিত সুলতানির রাজনৈতিক তত্ত্ব পরস্পর এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা চিন্তাই করা যায় না। কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিস দিল্লির সুলতান হিসাবে উলেমাদের সবসময় শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (১২৪৫-৬৫) বাংলা জয় করার পর উলেমাদের খুশি রাখার জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ তাদের মধ্যে দান করেছিলেন। সুলতান বলবনও খুব ভালভাবে অবহিত ছিলেন যে, উলেমাগণ ইচ্ছে করলে সুলতানিতে সুলতানের ক্ষমতার কর্তৃত্বের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। তিনিও তাই উলেমাদের সন্তুষ্ট রাখাই যুক্তিসংগত মনে করতেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাজনীতির ক্ষেত্রে উলেমাদের হস্তক্ষেপ কখনোই বরদাস্ত করেননি। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে উলেমাদের প্রতিপত্তি কখনোই ক্ষুণ্ণ করেননি তিনি। আলাউদ্দিনের মতো মহম্মদ-বিন-তুঘলকও উলেমাদের অন্যান্য সরকারি কর্মচারী হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অন্যদিকে ফিরোজ তুঘলকের আমলে উলেমাগণ পুনরায় স্বমহিমা অর্জন করেন। পাশাপাশি আফগান সুলতানগণও উলেমাদের সমীহ করে চলতেন এবং উলেমাদের ধর্মীয় প্রভাব তাদের শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকাল বাদ দিয়ে দিল্লি- সুলতানির আমলে উলেমাগণ সুলতানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মদত গড়ার ভূমিকা পালন করেছেন। তাই দিল্লি-সুলতানি অবশ্যই ইসলামিক চরিত্র অর্জন করেছিল বিশেষত ইসলামের

প্রচারক ও মুসলমানদের রক্ষাকর্তা হিসাবে। অমুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা জিহাদ ঘোষণা করবেন—এটাই ছিল স্বাভাবিক, যার স্বরূপ লক্ষ করা যায় অমুসলমানগণের উপর 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপনের মধ্যে।

২.২. সুলতান, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা

দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত দিল্লির মুসলমান শাসকগণ নিজেদের 'সুলতান' হিসেবে পরিচয় দিতেন। যদিও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথমদিকে 'সুলতান' পদটির অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না, কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে এই পদটির উৎপত্তি ঘটে। প্রথমদিকে এই পদটির বিভিন্ন অর্থ প্রচলিত ছিল। কোরানে 'সুলতান' কথাটির অর্থ হল সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু মিশরে এর অর্থ ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। অর্থের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের শাসক হিসাবে 'সুলতান' নামের প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হয়েছিল সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে।

ইসলামের বিকাশের প্রথমদিকে খলিফা বলা হত আমির-উল-মুমিনিম (commander of believers), যিনি মুসলমানদের সভা জম/ইত-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। খলিফা হিসাবে তিনি ছিলেন ইসলামি দুনিয়ার শাসক আর ইমাম হিসাবে তিনি ধর্ম ও সমাজের বিধান দিতেন। কিন্তু যখন খলিফার রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়, সেই সময়ে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন শাসক 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকার স্বগর্বে ঘোষণা করেছিলেন। একইভাবে গজনির মহম্মদ 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন—যার অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬) এই সুলতানিকে প্রকৃত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের কাছে প্রশ্ন ছিল—ভারতে কীভাবে সুলতানি সাম্রাজ্যের শাসক বা সর্বময় কর্তা হিসাবে তার শাসন মুসলিম দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে? এক্ষেত্রে দিল্লির প্রায় সমস্ত সুলতানিই একমত ছিলেন যে, তাদের রাজ্য হল মূলত খলিফার সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। যেহেতু প্রথানুযায়ী তখনও পর্যন্ত খলিফা ছিলেন ইসলামি দুনিয়ার সবময় কর্তা তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মুসলমান শাসকগণ নিজেদের খলিফার প্রতিনিধি (deputy) হিসাবে চিহ্নিত করতেন। স্বাভাবিকভাবেই বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি ছাড়া কোনো সুলতানের শাসনই বৈধতা অর্জন করত না। দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠার সময় খলিফার রাজনৈতিক আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়লেও, রাজনৈতিক তথা সাম্রাজ্যকে বৈধতাদানের (Legitimacy of political authority) কারণে দিল্লির সুলতানগণ খলিফার প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ইলতুৎমিস প্রথম বাগদাদের খলিফার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তার মুদ্রায় খলিফার নাম অঙ্কিত করে 'খুৎবা' পাঠ করেন (১২২৯)। ইলতুৎমিসের এই পদক্ষেপ সুলতান হিসাবে তার শাসন দিল্লি-সুলতানি তথা মুসলিম

দুনিয়ায় বৈধতা দান করেছিল। দিল্লির পরবর্তী সুলতানগণও ইলতুৎমিসের পদকে অনুসরণ করেছিলেন।

তবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬) খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকও আলাউদ্দিনের রীতি অনুসরণ করেছিলেন তার রাজত্বকালের প্রথমদিকে। তবে তার নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে দিল্লি-সুলতানিতে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি খলিফার স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে তার শাসনকে বৈধতাদানের চেষ্টা করেছিলেন। তবে খলিফার প্রতি ফিরোজ শাহ তুঘলকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল অকুণ্ঠ। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতানগণ খলিফার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রপরিচালনায় শাসকের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা (legitimacy of political authority) শুধুমাত্র খলিফার মতো ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ওপর নির্ভরশীল নয়। শাসিতের (ruled বা Subject) মধ্যে সুলতানকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজন ছিল। এর প্রয়োজনীয়তার জন্যই দিল্লির সুলতানগণ 'সুলতান' সম্পর্কে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুলতান নিজেকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য তারা কতকগুলি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন।

জিয়াউদ্দিন বরণীর *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি* ও *তারিফ-ই-ফিরোজশাহি* থেকে দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বরণী প্রচার করেছিলেন যে, সুলতান তার পদটিতে আসীন থাকার অপরাধে ক্ষমার অযোগ্য। পাপী কারণ কোরানে সুলতানের পদ বৈধ নয়। কিন্তু তিনি এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন যদি তিনি মুসলমানদের রক্ষা এবং উলেমাদের ওপর কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

অন্যদিকে বরণীর মতে, সুলতান হচ্ছেন 'আল্লাহর দূত'। তাই তিনি তার ও তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূরণ করেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দিল্লি-সুলতানির অবস্থা ছিল ভিন্ন। সুলতান যতদিন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারতেন ততদিনই তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকত। আল্লাহর ইচ্ছা নয় ববং তলোয়ারই শেষ কথা বলত।

বরণীর মতে, আর-একটি কারণে সুলতানের প্রয়োজন ছিল বিশেষ করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। শাসনব্যবস্থায়, নিয়োগ বা বরখাস্ত করা বা Stale laws রক্ষার দায়িত্ব ছিল সুলতানের ওপর। Zawabit বা State law in the technique of administration means pursuing a line of action which the king imposes as an obligatory duty on himself and from which he never deviates.

সুলতান বলবন সুলতানের মর্যাদা, অধিকার ও বৈধতা নিয়ে তার স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন তার পুত্র বুখরা খাঁর সঙ্গে আলোচনায়। বলবন মনে করতেন—King's heart is the

reflection of God. এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন তার প্রতিফলন নয়। কাজেই সুলতান জনগণের ইচ্ছাধীন নন। সুলতান হিসাবে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূরণ করাই তার কর্তব্য। শাসকের মনন যেহেতু আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত, তাই তিনি কেবলমাত্র তাঁর কাছেই দায়বদ্ধ। সুলতান অবশ্য তার পদটির জন্য আল্লাহর কাছে ঋণী। এই ঋণ শোধ করা যাবে সুলতানের পদের সঙ্গে যুক্ত কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনের মাধ্যমে। জনসাধারণের মঙ্গালের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। তবে বলবন অমুসলমানদের 'জনগণ' থেকে বাদ দিয়েছেন।

বলবনের মতো আলাউদ্দিন খলজিও মনে করতেন যে, 'সুলতান' হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর মতে, Kingship knows no kingship. তাই রাষ্ট্রের অন্যান্যরা প্রত্যেকেই সুলতানের প্রজা বা কর্মচারী। এমনকি উলেমাদেরও তিনি শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে দিতে রাজি ছিলেন না।

২.৩. গ্রন্থপঞ্জি

১. U. N. Dey : The Government of the Sultanate (New Delhi, 1972).

২. K. A. Nizami : Some Aspects of Religion and Politics in India during the Thirteenth Century (Aligarh, 1961).

৩. J. S. Grewal (ed) : The State and Soceity in Medeival India (New Delhi, 2005).

৩.৪. অনুশীলনী

১. সুলতানির স্বরূপ নির্ণয় করুন।

২. খলিফার সঙ্গে দিল্লি-সুলতানির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩. দিল্লির সুলতানগণ কীভাবে শাসনতান্ত্রিক বৈধতা অর্জন করতেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

—

একক-৩ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ

গঠন

৩.০. প্রস্তাবনা
৩.১. প্রথাগত কেন্দ্রীভূতরাজ্য
৩.২. চোল রাষ্ট্র
৩.৩. কেন্দ্রীভূত দিল্লি-সুলতানি
৩.৪. গ্রন্থপঞ্জি
৩.৫. অনুশীলনী

৩.০. প্রস্তাবনা

প্রথাগত ঐতিহাসিকগণ ভারত ইতিহাসচর্চার সময় থেকে ভারতের রাজ্য বা রাষ্ট্রসমূহকে মূলত রাজা বা সম্রাটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা প্রচার করে আসছেন। কেন্দ্রীকরণের মূল উৎস ছিল রাজা। তার অধীনস্থ আমলা ও কর্মচারীর দ্বারা চালিত হত প্রাদেশিক ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শাসন। রাজ্যরক্ষা বা বিস্তারের হাতিয়ার সেনাবাহিনীতে থাকত রাজার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু প্রথাগত ঐতিহাসিকদের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বা কেন্দ্রীকৃত গঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে না। বরং আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দেখা যায় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্রসমূহতে বিকেন্দ্রীভূত শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। বিকেন্দ্রীকরণের পরিণতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ। আমরা ইতিপূর্বে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল—বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকলেও গুপ্ত-পরবর্তী ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত গঠনের ধারাও চালু ছিল। কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চোল সাম্রাজ্য ও দিল্লি সুলতানির ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীভূত গঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা এখানে আলোচনা করা হল।

৩.১. প্রথাগত কেন্দ্রীভূত রাজ্য

প্রথাগত ধারণায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা হল শাসক বা শাসকগোষ্ঠির দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত স্তরের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটা ছিল রাজা বা সম্রাট ও সহযোগীদের দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে ছিল বিভিন্ন

স্তরবিশিষ্ট একটি শাসকগোষ্ঠী যা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শনের দ্বারা বৈধতা অর্জন করত।

সমসাময়িক ভারতীয় এবং চিনা ও আরবিয় পর্যটকদের ওপর ভিত্তি করে প্রথাগত ঐতিহাসিকগণ রাজা বা সম্রাটকে সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিয়েছেন। শাসকগণ সাধারণত উচুস্থানের মর্যাদাযুক্ত উপাধি গ্রহণ করতেন। যেমন—*মহারাজা-ধিরাজ* বা *পরম ভট্টারক* ইত্যাদি। শাসনকার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকত রাজার হাতে। প্রজার মঙ্গালসাধন ছিল রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তবে রাজারা প্রজাদের কল্যাণের জন্য তৎপর থাকতেন। কারণ ছিল ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব। হিউয়েন সাঙের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাই ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনকে 'প্রজাকল্যাণকামী' শাসক বলা হয়েছে।

রাজার কাজে সহযোগিতার জন্য প্রতিটি রাজ্যেই থাকত একটি করে মন্ত্রীপরিষদ, যারা বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্বে থাকতেন। তা ছাড়া থাকতেন বিভিন্ন ধরনের সরকারি কর্মচারী। যেমন—হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থায় ছিল অবন্তি (পররাষ্ট্রবিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক), *সিংহনাদ* (প্রধান সেনাপতি), *কুন্তল* (অশ্ববাহিনীর প্রধান), *মহাসামন্ত, মহারাজা, মহাস্থানীয়, কুমারামাত্য, উপবিক, বিষয়পতি* ইত্যাদি।

রাষ্ট্রকূটদের শাসনব্যবস্থাতেও এই ধরনের পদগুলির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বাংলার পাল শাসনব্যবস্থাতেও *রাজা, রাজন্যক, রানিক, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, রাজস্থানীয়, দূত, অঙ্গারক্ষ* ইত্যাদি বিভিন্ন পদের কথা জানা যায়।

কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকত প্রাদেশিক যা আঞ্চলিক শাসকগণ। *ভুক্তি* (প্রদেশ) ও *বিষয়* (জলা) ছাড়াও আরও কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক এককের কথা জানা যায়।

রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষার জন্য রাজাও নিয়ন্ত্রণ করতেন সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজা রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের কর ও রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব জনকল্যাণ, শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মীয় দর্শনের প্রচারের কাজে ব্যয় করত, রাষ্ট্র যাকে এককথায় কেন্দ্রীকৃত উদ্‌বৃত্তের পুনর্বিতরণ (Redistribution of concentrated surplus)-এর পদ্ধতি বলা যায়। এটা শাসকের শাসন করার অধিকারকে বৈধতা দান করত।

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রথাগত এই ধারণা উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন বিংশ শতকের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, A. S. Altekar-এর *The Rashrakutas and Their Times* (1935) ও *State and Government in Ancient India,* R. K. Mokherjee-র Local Government in Ancient India, R. C. Majumdar-এর History of Ancient Bengal, ইত্যাদির কথা। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ আলোচিত সময়ের রাষ্ট্রসমূহকে কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্রীকৃত বলার পক্ষপাতী হন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মৌখরী, পাল, রাষ্ট্রকূট বা গুর্জর প্রতিহার এবং চালুক্য রাজ্য বা সাম্রাজ্যসমূহ উপস্থিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের বিকেন্দ্রীভূত শক্তির দ্বারা। ফলে এই রাজ্যগুলোকে

কেন্দ্রীভূত বলার পক্ষপাতী নন। R. S. Sharma, B.N.S. Yadav, R. M. Srimali বা তাদের সমর্থকগণ। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্র বিশেষ করে পল্লব ও চোলদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্রব্যবস্থার (Segmentary State System) উপস্থিতির কথা জাহির করেছেন Burton Stein, বা R. G. Fox-এর মতো ঐতিহাসিকগণ। এদের মতে, চোল বা পরবর্তীকালের বিজয়নগর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হলেও আদতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-এর কর্তৃত্বকে এরা খণ্ডন করতে পারেননি। বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য চোল ও সুলতানি রাষ্ট্রব্যস্থার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশগুলিতে।

৩.২. চোল রাষ্ট্র

আদি চোলদের পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক থাকলেও এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চোল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা ছিলেন বিজয়ালয়। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জোর দখলের মধ্য দিয়ে চোলদের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়। নবম শতকের মধ্যে কাঞ্চীর পল্লব এবং দক্ষিণ তামিল দেশ বা তোণ্ডমণ্ডল এর পাণ্ড্যদের দুর্বল করে দিয়ে চোল রাজগণ সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু সমসাময়িক রাষ্ট্রকূট শক্তি চোলদের বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর সুদূর দক্ষিণে চোলদের দ্রুত রাজ্যবিস্তার ঘটে।

চোলদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন রাজারাজা (৯৮৫-১০১৪) এবং তার পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-১০৪৪)। রাজারাজা তাঁর পিতার বর্তমানেই শাসক হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজ্য অভিষেকের পূর্বেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা ও শাসনকার্যের প্রভূত অভিজ্ঞতা তাঁকে রাজ্যবিস্তারে সহযোগিতা করেছিল। চেরাদের নৌবাহিনীকে পরাজিত করে ত্রিবান্দ্রম (তিরুবনন্তপুরম) অধিকার করেন তিনি। পাণ্ড্য রাজাকে পরাজিত করে তিনি মাদুরাই দখল করেন ও শ্রীলঙ্কায় নৌ-অভিযান পাঠান। উত্তরদিকে ভেঙ্গি ও কর্ণাটকের গঙ্গাদের রাজ্য আক্রমণ করেন রাজারাজা। রাজারাজার নীতি অনুসরণ করেন তার সুযোগ্য পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র। চেরা ও পাণ্ড্যদের রাজ্য সম্পূর্ণভাবে চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি এবং শ্রীলঙ্কা বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

চোল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথমদিকে অর্থাৎ নবম-দশম শতকে চোল সম্রাট একাই তোণ্ডমণ্ডলের শাসক ছিলেন না। সেখানে প্রথাগত কিছু গোষ্ঠীপ্রধান রাজার আধীনস্থ হিসাবে শাসন করতেন। এই গোষ্ঠীপ্রধান নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ছিলেন প্রায় স্বাধীন। এমনকী তাদের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা ও সেনাবাহিনীও ছিল। তবে তারা চোল সম্রাটের বিরোধিতা করতেন না বরং সাম্রাজ্যবিস্তারে চোল সম্রাটদের সহযোগিতা করতেন। কিন্তু দশম শতকের শেষ ও একাদশ শতকের এই গোষ্ঠীপ্রধানগণদের নির্মূল করে তাদের অধিকৃত অঞ্চল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন রাজারাজা ও প্রথম রাজেন্দ্র। অঞ্চল হারানো এই প্রধানদের চোলদের নতুন শাসনব্যবস্থায় স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতকে পুনরায় এই প্রধানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চোলরাষ্ট্রের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রাজারাজা (১ম) অধিকৃত অঞ্চলের পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি নতুন নামকরণ করেন। জয়ীকৃত অঞ্চল সমূহকে বলা হতে থাকে বলনাড়ু। রাজারাজার শাসনতান্ত্রিক আর-একটি উদ্ভাবন ছিল 'মণ্ডলম' নামের শাসনতান্ত্রিক এককের সৃষ্টি। বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের পূর্বতন নামের পরিবর্তে এখন *মণ্ডলম* নামে পরিচিত হতে থাকে। তাই পণ্ডিনাড, পাণ্ড্যদেশ, পরিচিত হয় রাজারাজা মণ্ডলম হিসাবে। একইভাবে তোণ্ডাইনাড়ু ও চোলনাড়ু পরিচিত হয় যথাক্রমে জয়গোণ্ডা-চোলমণ্ডলম ও চোলমণ্ডলম হিসাবে। এই মণ্ডলমগুলি শুধুমাত্র নতুন নাম ছিল না, বরং প্রধানদের অঞ্চলসমূহকেও এখানে সংযুক্ত করা হয়। যেমন চোলমণ্ডলম-এ পূর্বতন চোলনাড়ু (core area) ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মালনাড়ু, কোনাড়ু, ইরাঞ্জুনা পাড়ি ইত্যাদি যোগ করা হয়। তবে চোল শাসনব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি ছিল নাড়ু। যদিও নাড়ুকে সাধারণভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক একক (political territorial unit) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাড়ু ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মাপের কৃষি অঞ্চল (agricualtural micro region)।

চোল রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বতোভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র। যেহেতু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের নৃপতির পদ থেকে চোল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি, তাই দশম-একাদশ শতকে চোল সম্রাটগণ উচ্চমর্যাদাযুক্ত উপাধি করতেন। এখন থেকে তারা *পেরুমান* বা মহান পুত্র (Peruman or great son) হিসেবে পরিচিত হতে থাকনে। দশম শতকের মধ্য থেকে রাজা ও প্রজার মধ্যে সামাজিক পার্থক্যও বাড়তে থাকে। প্রজারা রাজাকে *উণ্ডাইয়ার* (Undaiyar) বা 'আমাদের প্রভূ' বলে সম্বোধন করতে থাকে। একাদশ শতকের শেষ ও দ্বাদশ শতকের গোড়ায় চোল সম্রাটগণ 'চক্রবর্তী' (সম্রাট) এবং *ত্রিভুবন চক্রবর্তী* (ত্রিলোকের সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপাধি গ্রহণের প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তৎকালীন কতকগুলি দেবদেবীর উপাধি রাজার উপাধির সমতুল ছিল। এমনকি কোনো কোনো। রাজা দেবদেবীর Tolan বা বন্ধু (comrades) হিসেবেও পরিচয় দিতেন।

চোল সম্রাটগণ প্রত্যেকেই বহুবিবাহের অনুসারী ছিলেন। প্রথমদিকে সাধারণ পরিবারের বা দেবদাসীদের সঙ্গে রাজাদের বিয়ে হলেও পরবর্তীকালে গোষ্ঠীপ্রধান বা আঞ্চলিক প্রধানদের পরিবারের সঙ্গে রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই বিবাহগুলি চোল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষেও সহায়ক ছিল। অগ্রজের অধিকার ছিল উত্তরাধিকারের নিয়ম। অভিষেক সম্পন্ন করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ।

চোল শাসনব্যবস্থায় রাজার অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে। তিনি আইন বা সর্বোচ্চ আদেশ জারি করার অধিকারী ছিলেন। রাজাদেশকে বলা হত Tiru-aanai (বা the sacred command). চোল লিপিগুলিতে রাজাদেশ বা রাজাজ্ঞা প্রচারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আধিকারিকদের কথা বলা হলেও আইনব্যবস্থা নির্ণয়ের কোনো স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না এগুলিতে। তবে একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হত সর্বোচ্চ আধিকারিক (অধিকারী) থেকে শুরু

করে সর্বনিম্ন সেনার দ্বারা।

চোল শাসনের প্রথম শতকে সরকারি আধিকারিক বা আমলাদের সংখ্যা ও পদ ছিল অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু আঞ্চলিক বিস্তৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও সামরিক বিভাগে। *তিরুমন্দিরা-ওলাই* ছিলেন রাজার মুখ্য সহায়ক (ব্যক্তিগত সচিব)। এই পদটি চোলদের সমগ্র শাসনকালে প্রচলিত ছিল। *অধিকারী* পদাধিকারী আধিকারিকগণ ছিলেন প্রধান বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। প্রথমদিকে এদের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছিল। *নাড়ু ভিরুক্কাই* ছিল বিচারব্যস্থার সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি দপ্তর। এদের প্রধানদের বলা হত *ভট্ট* (বা শিক্ষিত ব্রাহ্মণ)। একাদশ শতকে *সেনাপতি* ছিল আর-একটি উল্লেখযোগ্য পদ। দ্বিতীয় শ্রেণির সামরিক পদকে বলা হত *দণ্ডনায়গম*। পাশাপাশি ছিল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের দপ্তর বা *পুরাবুভাড়ি-তিনাইক্কালাম* (Puravuvari-Tinaiikkalam) যা দশম শতকে গঠিত হয়েছিল।

কর সংগ্রাহকদের নীচে ছিলেন আঞ্চলিক আধিকারিকগণ (Nadu-level officials) যাদেরকে বলা হত *নাড়ু-ভাগই*। এদের প্রধান কাজ ছিল কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহ করা। এছাড়া ছিল শ্রীকারিয়মগণ যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করা।

আধুনিক গবেষণায় চোলদের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের কর সংগ্রহের বিষয়ে জানা যায়। *Kadamai, Kudimai* কারিগর বণিকদের থেকে সংগ্রহিত করা বিবিধ কর (Miscellaneous taxes) ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় চোল ইতিহাসের উপাদানগুলিতে। *কাদামাই* ছিল মুখ্য ভূ মিকর। এর অন্যান্য নাম ছিল *পুরাভূ, ঈরাই, কানিক-করণ, মেলভারম, অপাড়ি* ইত্যাদি। কুদিমাই ছিল বিনাবেতনের শ্রম (বা Corvee বেগাড়)। যা *ভেত্তি* (সংস্কৃত ভিস্তি), *অমনজি, মুত্তাইয়লি* এবং *ভীতিনাই* নামেও পরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল *কারিগর* ও বণিকদের ওপর আরোপিত *পাট্টম* এবং *আয়ম* নামের কর। চতুর্থ শ্রেণির কর ছিল *চৌকিদার কর,* জরিমানা, উপহার, সাময়িক কর ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত।

ভূমিকর সাধারণত ভূমির মালিক (কানিয়ালির সরাসরি সরকারকে প্রদান করত, যা নির্ধারিত হত ভূমি পরিমাপের পর। *Ulukudi* বা প্রকৃত কৃষক ও *আদিমাই* (দাস শ্রমিক), গণ করদান করত তাদের ওপরওয়ালা বা কানিয়ালরদের। বেগার শ্রম (বুদিমাই)-এর দ্বারা সাধারণত সেচব্যবস্থার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হত চোল শাসনের প্রথমদিকে। কিন্তু রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও রাজ প্রাসাদ ও মন্দির-এর ক্ষেত্রেও কুদিমাই আদায় প্রযোম্য হয়। ফলে প্রকৃত কৃষকের (Ulukudi) ওপর দায়ভার বেড়ে যায় এবং সামান্য ঘটনাতেই তারা রাষ্ট্রশক্তি তথা ভূমিমালিকের বিরোধিতা করে, যারা মূলত ছিলেন ব্রাহ্মণ বা বেল্লাল। অন্যদিকে নিষ্কর ভূমিদানের (ব্রাহ্মদেওয়া ও দেবদান) প্রথা রাষ্ট্রের আয় কমে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে দানপ্রাপ্ত জমির জন্যও দানগ্রহীতা সর্বোতোভাবে কর থেকে রেহাই পেতেন না।

চোল শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সভাসমূহের

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ব্রাহ্মণদের গ্রামসমূহ (অগ্রহার)-তে তাদের সভা রাজার একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্থানীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি করত। তবে রাজার গ্রামীণ প্রতিনিধি (উড়-আলবান)-র ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এমন চোল শাসনের শেষার্ধে এই *ব্রাহ্মদেওয়া* গ্রাম ছাড়া এর অস্তিত্ব ছিল না। *উড়-আলবানের* প্রধান কাজ ছিল করসংগ্রহের তদারকি করা। সাধারণ গ্রামসমূহে *উড়-আলবান* পদের অস্তিত্ব ছিল না। কর সংগ্রহের জন্য এক্ষেত্রে উড়িল-তাণ্ডিনিনরাম, কৌমুরার্ভার ও মুদালিগলি নামের রাজকর্মচারীগণ ছিলেন। গ্রামের হিসোবরক্ষার জন্য গ্রামগুলি নিয়োগ করত উড়কারনমদের। এরা গ্রামের কর্মচারী ছিলেন, সরকারের নয়। স্থানীয় শাসনের জন্য গ্রামগুলির নিজস্ব বিচার ও পুলিশব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামেও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যারা স্থানীয় শাসনের অংশীদার হয়ে ওঠে।

চোল রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতো ঐতিহাসিক এই ব্যবস্থাকে 'Highly Centralised State' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু গত কয়েক দশকে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতকে সমালোচনা করে তিনটি নতুন মতামত উঠে এসেছে চোল শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের বিষয়ে। এগুলি হল সামন্তরাষ্ট্র, কেন্দ্রীভূত বিভাজিত রাষ্ট্র (Segmentary State) এবং আদি রাষ্ট্র (Early State)। তবে এটা কখনই আদি রাষ্ট্র নয়, কেননা শুন্য থেকে এর শুরু হয়নি। বরং প্রাক্ চোল রাষ্ট্রব্যবস্থা (পল্লব, পাণ্ড্য, চেরা ইত্যাদি)-র চলমানতাই ছিল চোল রাষ্টব্যবস্থা। আর কেন্দ্রিনিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্র এর ধারণা আফ্রিকায় নৃত্তাত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত Burton Stein-এর হাত ধরে চোলদের শাসনব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে, যা স্বায়ত্ত শাসনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এটা অবশ্য সমস্ত রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রিভূত শাসনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, চোল রাষ্ট্রের তিনটি পর্যায় ছিল—

(১) প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী (৮৫০-৯৪৫), (২) সাম্রাজ্যবাদী (৯৮৬-১১০০) ও (৩) সাম্রাজ্যোত্তর (১১০০-১২৫০)।

প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে রাজার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল এবং স্থানীয় শাসকগণ ছিলেন বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। শাসনব্যবস্থায় জটিলতাও ছিল কম। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে রাজা হয়ে ওঠেন শাসনব্যবস্থার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রক। সংগঠিত আমলা, সেনাবাহিনী ও শাসনযন্ত্রের দ্বারা তৈরি হয় এক-কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে সাম্রাজ্যোত্তর পর্যায়ে প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের দায়ভার বৃদ্ধি পায় ও রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতার জন্যও তারা সাহসী হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা কেন্দ্রীভূত চোল শাসনকে বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র (Decentralised State) হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত নয়।

৩.৩. কেন্দ্রীভূত দিল্লি-সুলতানি

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল দিল্লি-সুলতানি যা বিকেন্দ্রীভূত ভারতীয় সামন্তরাষ্ট্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তুর্কিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুলতানি শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এককেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল-এর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় এর থেকে আর নতুন নতুন ছোটো রাজ্যের উত্থান ঘটে।

যদিও দিল্লির সুলতানদের অনেকেই নিজেদের বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার অধীনস্থ সামরিক নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং খলিফার নাম ও *খুতবায়* খোদাই করেছেন, কিন্তু খলিফা কখনোই দিল্লি সুতানির বৈধ শাসক ছিলেন না। দিল্লির সুলতানিরা দিল্লি সুলতানিকে মুসলিম জগতের অংশ হিসাবে মাঝে মাঝে ঘোষণা করতেন এবং এখানে খলিফার কেবলমাত্র প্রতীকী উপস্থিতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, আইনগত ও সামরিক কর্তৃত্বের মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন সুলতান নিজে। রাষ্ট্রের বিকাশ ও নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল তাঁর। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তথা সেনাবাহিনীর প্রধান নায়কও ছিলেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা তথা বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতাও ছিল তাঁর হাতে। সুলতানগণ সাধারণত বিচারব্যবস্থাতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন। সুলতান বলবন ও আলাউদ্দিন খলজির নিরপেক্ষ বিচার সুবিদিত ছিল। মহম্মদ-বিন-তুঘলক এক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি উলেমাদেরও সমবিচারে (Uniformity of law)-র আওতায় নিয়ে আসেন।

দিল্লি-সুলতানির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। সুলতানের যে-কোনো পুত্রই পরবর্তী সুলতান হতে পারতেন। এমনকি ইলতুৎমিস তাঁর পুত্রদের পরিবর্তে তার কন্যা রাজিয়াকে (১২৩৬-৪০) সুলতান নির্বাচিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক মুসলিম বা হিন্দু কোনো রাজনৈতিক আদর্শেই অগ্রজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের বৈধতার প্রশ্ন থাকলেও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুলতানি দখলও অবৈধ ছিল না। দিল্লি-সুলতানির ক্ষেত্রে এর একাধিক উদাহরণ বিদ্যমান। তাই সামরিক ক্ষমতা সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল।

সুলতানকে সাহায্য করার জন্য সুলতান তার ইচ্ছানুসারে মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন, যারা সুলতানের ইচ্ছানুসারেই পদচ্যুতও হতেন। মন্ত্রীদের সংখ্যা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হত। তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে দিল্লি সুলতানিতে একটা নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পর মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন *উজির* (Wazir)। প্রথমদিকে উজিরগণ ছিলেন মূলত সামরিক নেতা। কিন্তু চতুর্দশ শতকে উজির সামরিক দায়িত্বের চেয়ে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের বেশি গুরুত্ব পান। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক এক্ষেত্রে বিশেষ

ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উজির পর প্রধান সরকারি বিভাগ ছিল *দেওয়ান-ই-আরজ* বা সামরিক বিভাগ। এই বিভাগের প্রধানকে বলা হত *আরজ-ই-মমালিক*। তবে তিনি কিন্তু সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপাতি ছিলেন না, যেহেতু সুলতান নিজের হাতেই রেখেছিলেন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ। কেননা সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সুলতানের অস্তিত্বই তৎকালীন যুগে সম্ভব ছিল না। বলবনই প্রথম পৃথক সেনাবিভাগ (arz) স্থাপন করেছিলেন, যা আলাউদ্দিন খলজির আমলে আরো সংগঠিত রূপ ধারণ করেছিল। আলাউদ্দিন খলজি সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন এবং দুর্নীতি দমনের জন্য দাগ (Branding) প্রথা চালু করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজি নানাবিধ পরীক্ষানীরিক্ষা ও পদ্ধতির মাধ্যমে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে এটা দিল্লি সুলতানির সাধারণ কোনো ব্যবস্থায় পরিণত হয়নি।

দিল্লি-সুলতানির উল্লেখযোগ্য আরও দুটি দপ্তর ছিল—*দিওয়ান-ই-রিসালাত* (Diwan-i-risalat) ও *দিওয়ান-ই-ইনসা* (Diwan-i-insha)। *দিওয়ান-ই-রিসাল*-এর কাজ ছিল ধর্মীয় ব্যাপার, পবিত্র সংগঠন ও গুণীজনদের ভাতার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা। এই বিভাগটি সাধারণত একজন মুখ্য *কাজি* বা *সদ্‌র* -এর দ্বারা পরিচালিত হত। তিনি আবার বিচারবিভাগেরও সর্বোচ্চ আধিকারিক ছিলেন। কাজীগণ বেসামরিক (civil) বিচারের জন্য ইসলামি আইন (বা শারিয়া)-এর ওপর নির্ভর করতেন। হিন্দুদের বিচারের জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা ছিল না, তাদের জাতি-সভা বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। *দেওয়ান-ই-ইনসার*-এর প্রধান কাজ ছিল সরকারের মধ্যে ও সুলতানির সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ রাখা।

উল্লিখিত বিভাগগুলি ছাড়াও দিল্লি-সুলতানিতে আর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। প্রধান *বারিদ* বা গুপ্তচরের অধীনে সুলতানির বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করত অন্যান্য বারিদগণ। সুলতানের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাসাদ, *হারেম* ও *কারখানা* তদারকির জন্যও আলাদা বিভাগ ছিল। ফিরোজ তুঘলক দাসদের জন্যও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য পৃথক পূর্তবিভাগ সৃষ্টি করে ছিলেন।

দিল্লি-সুলতানির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে ছিল আঞ্চলিক বা স্থানীয় শাসন। সামরিক অভিযানের দ্বারা সৃষ্ট রাজ্যকে সুলতানগণ কতগুলি বদলি অঞ্চল বা ইক্তাতে ভাগ করেছিলেন। ইক্তার শাসককে বলা হত *মুক্তি* বা *ওয়ালি*। প্রথমদিকে মুক্তিগণ ছিলেন মূলত স্বাধীন। এরা শাসনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতেন এবং অতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত (Fazail) কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠাতেন। প্রয়োজনে সুলতানকে সামরিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু সুলতানের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিদের ওপর সুলতানের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক মুক্তিদের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করে তাদের কর সংগ্রাহক ও শাসনতান্ত্রিক আধিকারিকের পর্যায় নামিয়ে আনেন।

ইক্তার পরবর্তী শাসনতান্ত্রিক একক ছিল সিক্, যাদের নীচে ছিল পরগনা। সিক্ ও পরগনার ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নেই। পরগনার শাসক ছিল আমিলগণ। গ্রাম-শাসনে খুৎ ও মকদ্দমদেরও ভূমিকা ছিল।

দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের অবস্থান, শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি ও গঠনের প্রেক্ষিতে একে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বলা যায়। তবে প্রথমদিকে বা গঠনের সময় (Formative phase) সুলতানের অবস্থান ততটা শক্তিশালী ছিল না বরং অভিজাত, উলেমা ও মুক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। কিন্তু বলবনের আমল থেকে সুলতান হয়ে উঠেন সর্বশক্তিমান শাসন-নিয়ন্ত্রক। আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলক সুলতানিকে কেন্দ্রীকরণের শিখরে পৌঁছে দেন। কিন্তু ফিরোজ তুলঘলকের সময় এর অবক্ষয় শুরু হয়। চতুদর্শ শতকে লোদি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুলতানির সূত্রপাত ঘটে।

৩.৪. গ্রন্থপঞ্জি

১. Romila Thapar (ed) : Recent Perspectives of Early Indian History, Mumbai, 2002.
২. J. S. Grewal (ed) : The State and Society in Medievel India (New Delhi, 2005).
৩. Hermaun Kulke (ed) : The State in India 1000-1750 (New Delhi, 1995).
৪. R. C. Majumdar : History of Ancient Bengal.
৫. K. A. Nilkantha Sastri : The Cholas (Madras, 1835-37).
৬. R. S. Sharma : Indian Feudalism, (Calcutta, 1965).
৭. U. N. Day : The Government of the Sultanate, (New Delhi, 1972).
৮. K. A. Niazmi : Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century, (Aligarh, 1962).
৯. Y. Subbarayalu : The Chola State, Studies in History, Vol-IV, No 2, pp-265-306.

৩.৫. অনুশীলনী

১. আপনি কি মনে করেন যে আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত ?
২. চোল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গঠন আলোচনা করুন।
৩. দিল্লি সুলতানিকে কি কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যায় ?

একক-৪ : রাষ্ট্র ও সমাজ

গঠন

৪.০. ভূমিকা
৪.১. আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র
৪.২. আদি মধ্যযুগীয় সমাজ
৪.৩. দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র ও সমাজ
৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি

৪.০. ভূমিকা

আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ভারতের সর্বত্র একরকম ছিল। সময় ও অঞ্চলভেদে তাদের রূপ ছিল ভিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থার বির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার স্বরূপ ছিল ক্রমশ পরিবর্তনশীল। তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট (Fixed or Rigid) তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির (conceptual framework) দ্বারা খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক ও তাদের স্বরুপ নির্ণয় করা অসমীচীন। আলোচ্য এককে আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাষ্ট্র ও স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে।

৪.১. আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র

আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে বর্তমান পর্যায়ের পূর্ববর্তী এককগুলিতে ইতিপূর্বেই সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে দেখা যায় যে, গুপ্ত বা প্রাক্‌গুপ্ত যুগের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত শক্তির প্রভাবে বিকেন্দ্রীভূত রূপ পরিগ্রহ করেছিল পঞ্চম শতক থেকে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাই আবার কেন্দ্রীকরণের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে কেন্দ্রীভূত সুলতানি ও দক্ষিণ ভারতে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত চোল শাসনের স্তরে উন্নত হয়েছে।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বিংশ শতকের গোড়ায় আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। A. S. Altekar বা K. A. Nilkantha Sastri বা R.K. Mukherjee প্রমুখ তাঁদের গবেষণায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসের 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' (Asiatic Mode of Production) দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা পরিচালিত ও উদ্‌বৃত্ত শোষণকারী, কিন্তু প্রজাকল্যাণমূখী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তারা। কিন্তু বাস্তবে আলোচ্য সময়ের

রাজ্য বা রাজ্যসমূহ কোনোভাবেই নির্দিষ্ট (Fixed) বা অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় ছিল না। ফলে মার্কসের 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি'র ধারণা ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা বার্জিত হয়। কিন্তু সমাজ রাজনীতি বিবর্তনের ধারার সামন্ততন্ত্র-বিষয়ক মার্কসের ধারণা আদি মধ্যযুগীয় বা মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ব্যপকহারে প্রয়োগ করেছেন। ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সামন্ততন্ত্র ভারতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (Indian Feudalism) হিসাবে প্রচারিত হয়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত নতুন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত R. Coulborn সম্পাদিত '*Feudalism in History*' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে Daniel Thorner মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতের সামন্ততন্ত্র বিষয়ে কোনো গ্রন্থ এমনকি কোনো প্রবন্ধও লেখা হয়নি। Thorner এই মন্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে ওই বছরেই প্রকাশিত হয় সামন্ততন্ত্র তথা প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস-বিষয়ক D. D. Kosambi-র বিখ্যাত গবেষণা '*An Introduction to the study of Indian History*'. (Bombay, Popular Prakashan, 1956)। ওই একই বছরে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিষয়ে Kosambi-র আরও দুটো প্রবন্ধ *On the Development of Feudalism in India* (Annals of the Bhandarkar Oreintal Research Institute, 36 (1956), pp-258-69) এবং *Origin of Feudalism in Kashmir* (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. 31/32 (1956), pp-108-20) প্রকাশিত হয়। Kosambi-র An Introduction to the study of Indian History-র দুটো অধ্যায় *Feudalism From Above* এবং *Feudalism from Below* ছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটির প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এর দু বছর পর R. S. Sharma ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ-বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তবে Sharma-র বিখ্যাত *Indian Feudalism* (Calcutta, 1965) প্রকাশিত হয় 1965-তে।

Sharma-র মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তির কারণ ছিল পুরোহিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের নিষ্কর ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে। ভূমিদানের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দান করার ফলে দানপ্রাপ্ত ভূমিতে দানগ্রহীতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত উৎপাদন করে দানগ্রহীতা অতিরিক্ত ভূমিকর আদায়ে উদ্‌গ্রীব হয়। পাশাপাশি মুদ্রাব্যবস্থা ও বাণিজ্যের অবক্ষয় বণিক ও কারিগরদের ভূমিমুখী করে তুলেছিলেন। ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিত উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ ও ভোগ করার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল কথা।

Sharma বক্তব্যের সমর্থনে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় 1964 সাল থেকেই। D. C. Sirkar, Sharma-র মুক্তিকে খণ্ডন করে '*Landlordism Confused with Feudalism*' প্রকাশ করে 1966 খ্রিস্টাব্দে। Sirkar-এর মতে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ বা রাষ্ট্রে *সামন্ততন্ত্র* খুঁজতে যাওয়া অসমীচীন, কেননা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য

(Historical sourecs)-সমূহ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র এর অস্তিত্বকে সমর্থন করে না। একথা সত্যি যে, পুরোহিত শ্রেণিকে নিষ্কর ভূমি দান করা হত। কিন্তু এই দানগুলির বেশিরভাগই ছিল পতিত জমি। ফলে Sharma-র বক্তব্যকে Sirkar সমর্থন করেননি। তাই সাময়িকভাবে 'Indian Feudalism'-এর ওপর গবেষণা ধামাচাপা পড়ে। এমনকি পরবর্তীকালের Indian Feudalism-এর সমর্থক ও Sharma-র সুযোগ্য ছাত্র D. N. Jha তাঁর Ph. D.-র গবেষণায় Indian Feudalism বিষয়ক একটি শব্দও প্রয়োগ করেননি (Revenue system in Post Maurya and Gupta Times–(1967).

তবে সাতের দশকে আবার Indian Feudalism-এর ওপর ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। 1973 খ্রিস্টাব্দে B.N.S. Yadav-এর *Society and Culture in North India in the Twelfth Century* (Allahabad, 1973) প্রকাশিত হয়। Yadav নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ভূমিদানের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের বিষয়কে প্রমাণ করেন। Yadav-এর মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল *সামন্ত*, যারা ষষ্ঠ শতক থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। Yadav-এর পর *Indian Historical Review*-তে Indian Feudalism-বিষয়ক R. S. Sharma ও তার সমর্থকদের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে B. D. Chattapadhyay তার *'Trade and Urban Centres in Early Medieval North India'* (Indian Historical Review pp-203-9) প্রকাশ করেন এবং ভারতে সামন্ততন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও নগরের অবক্ষয়ের যুক্তিকে খণ্ডন করেন।

1979 ও 1980 সাল ভারতীয় সামন্ততন্ত্র চর্চার উল্লেখযোগ্য সময়। ওই বছরগুলিতে Indian History Congress অধিবেশনে D. N. Jha (*Early Indian Feudalism : A Historiographical Critique,* 1979), Harbans Mukhia (Was there Feudalism in Indian History, 1979) এবং B.N.S. Yadav (*The Problem of the Emergence of Feudal Relations in Early India,* 1980) ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য মতামত জ্ঞাপন করেন। Harbans Mukhia Jha ও Yadav-এর বক্তব্য সমর্থন না-করে বলেন যে, ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আজ্ঞাধীন কৃষিশ্রমিক ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল না। কেননা ভারতের উর্বর ভূমি কৃষকদের স্বনির্ভর করে রাখত।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র-বিষয়ক গবেষণা দেশীয় বাতাবরণের বাইরে 1985 খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার সুযোগ পায় যখন Journal of Peasant Society বিশেষ সংখ্যা *Feudalism and Non-Eurpean societes* প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি D. N. Jha সম্পাদিত *Feudal social Formation in Early India* (1987) প্রকাশিত হয়। তবে এইজাতীয় আর-একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা ছিল V. K. Thakur-এর Historiography of Indian Feudalism (1989)। *Indian Feudalism* তথা ভারতীয় প্রাক্ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রবিষয়ে আর-একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা হল Hermann kulkue-এর *The State in India 1000-1700.*

আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রকে যারা সামন্ততন্ত্রের আমলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তাদের মূল দুর্বলতা হল যে, উপযুক্ত তথ্যের অভাব এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সর্বভারতীয় ভাবা এবং কয়েক শতাব্দীর সময় ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রের বিরোধী ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বে যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন, রাষ্ট্র বিষয়ে নতুন কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো দেননি।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ছাড়া আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র-বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক অবদান হল কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্র (Segmentary state)-এর ধারণা। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মতো Segmentary State-এর ধারণাটিও 1956 খ্রিস্টাব্দে প্রথম অত্মপ্রকাশ করে যখন A. W. Southall-এর আফ্রিকায় প্রেক্ষিতে *Alur society : A Study in Processes and Types of Domination* (Cambridge, 1956) প্রকাশিত হয়। তবে 1971 খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতের ইতিহাসে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু রাজপুত রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে R. G. Fox-এর *Kin, Clan, Raja and Rule* (Barkley, 1971) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের ধারণা ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাছাড়া B. Subbarao-এর The Personality of India (1956) এবং Burton stein-এর *Integration of the Agrarian System of South India* ও অন্যান্য রচনা এবং Y. Subbarayalu-র *Political Geography of the Chola Country* (1973) Segmentary state-এর ধারণাটিকে আরও মজবুত করে। তবে এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল Stein-এর *Peasant State and Society in Medeival South India* (1977)।

Burton Stein-এর মতে, পল্লব, চোল ও পরবর্তীকালের বিজয়নগর সাম্রাজ্য এর রাষ্ট্রব্যবস্থা তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল (zone)-এ বিভাজিত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় (Central), মধ্যবর্তী (Intermeidiate) এবং প্রত্যন্ত (Peripheral) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি অঞ্চল (Micro-Peasant region) যেখানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রায় ছিলই না বলা চলে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে রাজা ও তার সহযোগী গোষ্ঠী মধ্যবর্তী অঞ্চলকে নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। রাজার ক্ষমতাই ছিল সার্বভৌম। মধ্যবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রাখত।

Burton Stein ও তার সমর্থকদের এই ধারণা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বিনাবিচারে মেনে নেননি। R. S. Sharma এই ধারণার গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিরোধীরা আরও মনে করেন যে, আফ্রিকীয় সমাজ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে Stein-এর জবাব হল ইউরোপীয় সমাজ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে ভারতে কষ্টকল্পিতভাবে প্রয়োগে কোনো দোষ না-থাকলে আফ্রিকার সমাজ-রাষ্ট্রের মডেল ভারতের সমাজ-রাষ্ট্রে পরীক্ষাতে কোনো দোষ থাকার কথা নয়। যুক্তি ও প্রতিযুক্তির ধাক্কায় দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল স্বরূপকে চাপা না দিয়েও এক কথায় বলা যায় যে, সময় ও অঞ্চলভেদে

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন কখনও কেন্দ্রীভূত আবার কখনও কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত কিন্তু বিভাজিত।

৪.২. আদি মধ্যযুগীয় সমাজ

আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি ছিল দুটি—উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রথাগত জাতি ব্যবস্থা (Caste system)। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা সমাজব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সূচিত করেছিল। ফলে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী (Class) ও জাতি (Caste)-র অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

যথেচ্ছ সংখ্যায় ভূমিদান ও ব্যাবসাবাণিজ্য, নগর, শিল্প এবং মুদ্রাব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে রাষ্ট্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। এমনকি তাদের মুক্ত চলাচলও স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ দানপ্রাপ্ত এলাকায় দানগ্রহীতা *ধনজনসহিত* বা *প্রতিবাসী* জনসমেত অধিকার পেতেন। পাশাপাশি কৃষকগণও বহির্গমনের সুযোগ পেতেন না। তবে ভূ মিদানের ফলে নতুন নতুন অঞ্চলে কৃষির বিকাশ ঘটে এবং সেখানে কৃষক ও কারিগরদের বসতিও স্থাপিত হয়।

ভূমিদানের আর-একটি পরিণতি ছিল সামন্ত শ্রেণির বিকাশ। এরাই ছিলেন শাসকশ্রেণির প্রধান স্তম্ভ। সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে সামন্তপ্রভুদের পদ ও সামাজিক মর্যাদার একটা আভাস পাওয়া যায়। মহামণ্ডলেশ্বর, মাণ্ডলিক, মহাসামন্ত, সামন্ত, লঘুসামন্ত, কউত, বণিক, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধি থেকে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। পাশাপাশি বণিক ও কারিগর গণও তাদের মর্যাদার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন। হিসাবরক্ষক বা ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহকগণ (যারা মূলত কায়স্থ জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন) বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন, যেমন—করণ, করণিক, পুস্তপাল, চিত্রগুপ্ত, লেখক, দিবর ইত্যাদি। শিক্ষিত শ্রেণি হিসাবে কায়স্থদের উত্থান ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদায় আঘাত করেছিল। কায়স্থগণ আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক ছাড়াও চান্দেল্য ও কলচুরীদের দরবারে মন্ত্রী হিসাবেও আসীন ছিলেন।

তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, মূল উৎপাদক (কৃষক) ও উৎপাদনের উপায়- সমূহের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বেড়ে যায়। পুরোহিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিষ্কর ভূমিপ্রদানের ফলে তাদের হাতে চলে যায় উৎপাদনের উপায়সমূহ। অন্যদিকে প্রকৃত উৎপাদকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। বেগার, (Rudimai, Vishthi) শ্রমদানে বাধ্যবাধকতা কৃষকদেরকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিলে। ফলে সামান্য ঘটনাতেই কৃষকবিদ্রোহ ঘটত।

তকে কৃষকশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি গ্রামপ্রধান শ্রেণির বিকাশ ঘটে এই সময়। উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে এদের বলা হত *মহত্তর*। গ্রামের চাষযোগ্য জমির একটা বড়ো অংশও গ্রামের শাসনব্যবস্থা এদের নিয়ন্ত্রণে থাকত। ৯২০ খিস্টাব্দে রচিত হরিষেণাচার্য্যের *বৃহৎকথা কোষে* মহত্তরদের সামাজিক প্রতিপত্তির একটা স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতে এই গ্রামপ্রধানদের বলা হত *পট্টকিলাস*। আর দক্ষিণ ভারতে এদের সমগোত্রীয় ছিল *গাবুন্দাগণ*।

সামাজিক শ্রেণির কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতিব্যবস্থারও কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই সময়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র—এই চারটি মূল জাতির মধ্যে উপজাতি (Sub-caste) ও মিশ্র জাতি (Mixed caste)-র সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গুপ্তযুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা বহুবিধ পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। পেশার সঙ্গেই তাদের পরিচিতি নির্ভর করত। তাই পুরোহিতের কাজ ছাড়াও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করার ফলে এই সময়ে ব্রাহ্মণদের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বেড়ে যায়। বাংলায় এই সময় মোট ৫৬টি ব্রাহ্মণ উপজাতি (Sub-caste)-এর অস্তিত্ব ছিল।

ক্ষত্রিয়দের উপজাতি বা শাখাজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। তার প্রধান কারণ ছিল অক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা রাজ্য বা সাম্রাজ্য গঠন। অক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা সৃষ্ট রাজার শাসনকে বৈধ করে তোলার জন্য ব্রাহ্মণগণ তাদের ব্যবস্থাপত্র ও বংশাবলি রচনার মধ্য দিয়ে 'ক্ষত্রিয়' বলে প্রচার করতেন। এই বংশাবলিগুলিতে এই অ-ক্ষত্রিয় শাসকদের আদি পুরুষকে হিন্দুদের কোনো দেবতা বা কোনো ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের সঙ্গে যুক্ত করা হত। বিনিময়ে ব্রাহ্মণরা শাসকের কাজ জমিসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পেতেন। মধ্য-এশিয়া থেকে আগত হূণ বা গুর্জরগণ এইভাবেই ক্ষত্রিয় হিসাবে সামাজিক পরিচিতি লাভ করে। একই কথা বলা যায় কামরূপে বর্মন, ম্লেচ্ছ ও পাল বংশ এবং ওড়িশার শাসকদের ক্ষেত্রেও। পশ্চিম ভারতের সোলাকি, পরমার, চাহমান, তোমার, গাহরবাল ইত্যাদি ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টিও এই পদ্ধতির দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে জাতি-সংস্কৃতির (caste-culture) প্রবেশ করার ফলে শাসক কূল 'ক্ষত্রিয়োজনোচিত' উপাধি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন।

জাতি-কাঠামোতে নবসংযুক্ত মিশ্রজাতি হিসাবে এই সময়ে কায়স্থরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করে। তবে বণিক শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় বৈশ্য জাতির সামাজিক অবস্থান অধোগামি হয়। কিন্তু গুপ্ত-পরবর্তী যুগে শূদ্ররা আর নিজেদের দাসসুলভ কৃষিশ্রমিক বা কারিগরের কাজে সীমাবদ্ধ রাখেননি। হিউয়েন সাঙ (সপ্তম শতক) তাঁর বিবরণে শূদ্রদের স্বাধীন কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমসাময়িক স্মৃতিকারগণ শূদ্রদের অন্নদাতা (অন্যদা), গৃহস্থ ও কুটুম্বিন (আত্মীয়/বন্ধু) হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। শূদ্রদের মধ্যে আবার এই সামাজিক বিভাজন ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত *বৃহৎধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ শূদ্রদের বা মিশ্র জাতিকে সৎ ও অসৎ বা উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

সংকর বা মিশ্র জাতির উৎপত্তি ও তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে এই দুটি পুরাণ সমসাময়িক কালের প্রধান উৎস ছিল।

সৎ শূদ্র বা উত্তম এবং মধ্যম সংকর জাতির সামাজিক অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ হলেও অসৎশূদ্র বা অধম সংকর জাতির সামাজিক মর্যাদা ছিল অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্যদের সমতুল। অন্ত্যজ জাতির সংখ্যাও আদি মধ্যযুগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। অন্ত্যজ, ব্যাধ, বরাত, ভিল, চণ্ডাল, চর্মকার, দাস, রজক, ডোম, হাড়ি, বাগদি, সুরী প্রভৃতি জাতি অস্পৃশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন স্মৃতি বা পুরাণ- গুলিতে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরভারতীয় সভ্যতার জাতি সংস্কৃতি দক্ষিণভারতেও বিস্তারলাভ করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে জাতিব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতের সমাজ বিশ্লেষণের সূচকে পরিণত হয়। এখানকার জাতিকাঠামো ছিল একটু আলাদা। ব্রাহ্মণ, বেল্লাল (অব্রাহ্মণ ভূস্বামী), বলনগাই (স্থায়ী কৃষক), ইরনগাই (বণিক, কারিগর ও ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায়), পল্লার ও পারাইয়ার (অন্ত্যজ/দাসসুলভ শ্রমিক) এবং আদিমাই (দাস ?)-দের নিয়ে গঠিত ছিল এখানকার সমাজ-কাঠামো। এখনকার ব্রাহ্মণগণ পুরোহিত-এর কাজ ছাড়াও প্রভূত পরিমাণ জমির নিয়ন্ত্রক ছিলেন। বেল্লালগণও ছিলেন ভূমির নিয়ন্ত্রক। ব্রাহ্মণ ও বেল্লালদের জমির কৃষিশ্রমিকদের (পল্লার, পারাইয়ার) অবস্থান উত্তর ভারতীয় অন্ত্যজদের সমতুল ছিল। তা ছাড়া আদিমাইদের অস্পৃশ্য ও দাস বর্ণনা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে।

৪.৩. দিল্লি-সুলতানি ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ

প্রথমদিকে দিল্লি-সুলতানি ছিল গজনির সুলতান সিহাবুদ্দিনের সাম্রাজ্যের বর্ধিত অংশ। কিন্তু ১২১০ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিস (১২১০-৩৬) দিল্লি-সুলতানিকে স্বাধীন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অসামান্য কূটনৈতিক চালের দ্বারা তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে সুলতানিকে রক্ষা করেন (১২২১)। তাছাড়া সিন্ধু থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সুরক্ষার ব্যাপারে সদাজাগ্রত ছিলেন তিনি। তার ব্যক্তিগত দাস বাহিনী (Mulk-i-Shamshi)-র সাহায্যে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতেন। মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্থানের অভিজাতদের ঠাঁই দিয়েছিলেন তার দরবারে। সুলতানির অধিকাংশ অঞ্চল তিনি 'ইক্তা' হিসাবে মুক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারা ভূমি ও উপঢৌকন সংগ্রহ করে সেনাবাহিনী ও ইক্তার শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত এবং উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব (ফাজাইল) সুলতানের দরবার পাঠাত। দিল্লিও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল ছিল সুলতানের নিজের অধীনে (খালিসত)। ইলতুৎ নিজস্ব সেনাবাহিনী (hashm-i-qalb) রক্ষা করতেন ভূমিভোগের অধিকারদানের মাধ্যমে।

ইলতুৎমিসের আমলে দিল্লি ভারতের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিভাসী, বণিক, কারিগর ও অর্থের সমাগম ঘটে দিল্লিতে। যারা

দিল্লির অর্থ সামাজিক বিবর্তনে সহায়তা করে। ইলতুৎমিস সোনা, রূপা ও তামার প্রামাণ্য মুদ্রা প্রচলন করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রাধান্য ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেন।

১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর ত্রিশ বছরে বেশ কয়েকজন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজিয়া (১২৩৬-৪০) ও নাসিরুদ্দিন (১২৪৬-৬৬)। এই সময়ে অভিজাতদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মুক্তিদের উচ্চাকাঙ্খা সুলতানির ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল, কিন্তু সুলতান বলবন (১২৬৬-৮৭) সুলতানিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। সুলতান বলবন নিজেকে উচ্চবংশ জাত আখ্যা দিয়ে সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তার মতে, সুলতান হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি। বলবন তার ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য নিজ জাতিভক্তদের বেশি করে ঠাঁই দেন তার দরবারে। তবে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্ভাবনা ও মোঙ্গাল আক্রমণের ভয় থাকার জন্য তিনি নতুন কোনো অঞ্চল দখল করেননি। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে দিল্লি-সুলতানির সামাজিক কাঠামোর নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের বিভিন্ন শহর (লাহোর, মুলতান, উচ, ভাস্কর, সেওয়ান)-এর শিক্ষিত মুসলমানগণ দিল্লি-সুলতানিতে ঠাঁই পান। তা ছাড়া গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে বাদায়ুন, কারা, অযোধ্যা ও লক্ষ্মনাবতীতে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তে থাকে মূলত সামরিক ব্যক্তিবর্গ হিসাবে। হিন্দুদের মধ্যে রনক (যোদ্ধা) ও রাউত (রাজপুত ঘোড়সয়ার)-গণ সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করে নানাবিধ সুবিধা ভোগ করতেন।

সামরিক ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আর-একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটে এই সময়। তারা মূলত ছিলেন হিন্দুবণিক ও শেট। সুলতানি বণিকগণ বলবনের আমলে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেন। এরা মুক্তিদের আগাম ঋণ (Advance/Loan) দিতেন এবং বিনিময়ে উচ্চহারে সুদ আদায় করতেন।

বলবনের মৃত্যুর পর সুলতানিতে নানাবিধ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয় যার পরিণতি হিসাবে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে খলজি মালিকদের উত্থান ঘটে। খলজিরা অপেক্ষাকৃত নীচু বংশজাত হলেও দিল্লি-সুলতানির সীমানাবিস্তারে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জালাউদ্দিন খলজি (১২৯০-৯৬), আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬) এবং পরবর্তী শাসকবংশের মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-৫১) দিল্লি-সুলতানির সীমাকে দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত করেন। সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি সুলতানিতে সুলতানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। আলাউদ্দিন খলজি উৎপাদিত শষ্যের অর্ধাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি স্থানীয় প্রশাসক, *চৌধুরী*, গ্রামপ্রধান ও ক্ষুত (*রণক* ও *রাউতদের* উত্তরাধিকার)-দের বিশেষ অধিকার খর্ব করেন। আলাউদ্দিনের এই ব্যবস্থা ও বাজার দরনীতি (Market control) পুরোনো অভিজাতদের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও শাসনশ্রেণি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মুক্তিদের ক্ষমতাও খর্ব করে দিয়ে ইক্তাগুলিতে সুলতানি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া *শারিয়াতি* আইনের পরিবর্তে সুলতানি আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সরকারি উচ্চপদে

হিন্দুদের নিয়োগের প্রথাও চালু হয়। ফলে উলেমা বা প্রথাগত শারিয়ত ব্যাখ্যাকারী ও সুবিধাভোগী মুসলমান শ্রেণির স্বার্থ বিনষ্ট হয়।

শাসনতান্ত্রিক নীতি পরিবর্তনের ফলস্বরূপ অভিজাত শ্রেণির গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। বরণী লিখেছেন যে, মদ প্রস্তুতকারক (শুঁড়ি) থেকে শুরু করে নাপিত, পাঁচক, মালি, তাঁতি, চাষি এবং বাজারী (Market men low born)-গণ অভিজাত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের সেনাবাহিনীতে স্থান দেওয়ায় সেনাবিভাগে তুর্কি অভিজাতদের একাধিপত্য বিনষ্ট হয়।

সুলতানি আমলে বণিক শ্রেণি ও নগরের বিকাশ উল্লেখযোগ্য বিষয়। বণিক ও শাহ্‌দের সম্পত্তিতে আলাউদ্দিন খলজিও হাত দেননি। শরফ (Monenylnder), সুলতানি বণিক মুসলিম বেহড় বণিকদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরের অন্যান্য সামাজিক শ্রেণি বিশেষ করে কেরানী, দোকানদার, কারিগর প্রভৃতিদেরও উন্নতি ঘটেছিল। এ ছাড়া শহরে গৃহভৃত্য (Domestic labour), দাস (Slave) ও ভিক্ষুকদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল। নগরে কৃষি উদ্‌বৃত্তের (Agricultural surplus) কেন্দ্রীকরণের ফলে নগরের সমৃদ্ধি ঘটে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নগরগুলি ছিল সামাজিক অসমতার চূড়ান্ত উদাহরণ।

পাশাপাশি কৃষক শ্রেণির অবস্থাও সুলতানি আমলে মোটেও ভালো ছিল না। মুক্তিদের বা সুলতানের চাহিদা মোটানোর পর কৃষকদের হাতে যা থাকত তা দিয়ে কৃষকদের বেঁচে থাকার মতো অবস্থা থাকলেও উন্নতির পথ স্তব্ধ ছিল। আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলক কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা বাড়িয়ে তাদের অবস্থা করুণ করে তুলেছিলেন। সুলতানদের দেওয়া কৃষিঋণ তাদের খুব একটা কাজে লাগত না। এই বিষয়ে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর আরও গবেষণার প্রয়োজন।

৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি

১. Hermann Kulke (ed) : The States in India 1000-1700 (New Delhi, 1995).
২. J. S. Grewal (ed) : State and Society in Medieval India (New Delhi, 2005).
৩. Burton Stein : Peasant State and Society in Medieval South India (OUP, 1980).
৪. D. D. Kosambi : In Introduction to the study of Indian History, (Bombay, 1956).
৫. R.S. Sharma : Indian Feudalism (Calcutta, 1965).
৬. D. N. Jha (ed) : Feudal order (New Delhi, 2000).
৭. V. K. Thakur : Historiography of Indian Feudalism (New Delhi, 1989).
৮. A. S. Allekar : The Rastrakutas and their Times (Poone, 1934).
৯. R. K. Mookherjee : Local Government in Anceint India (Delhi, 1958).

১০. I. H. Quereshi : The Administration of Sultanate of (Delhi/Lahore, 1942).
১১. B. N. S. Yadav : Society and Culture in India during the 12th century, (Allahabad, 1973).
১২. R. K. Barman : From Tribalism to State (Delhi, 2007).

৪.৫. অনুশীলনী

১. ভারতীয় সামন্ততন্ত্র কী ?
২. Segmentary State বা বিভাজিত রাষ্ট্র কি ?
৩. আদি ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের গঠন ব্যাখ্যা করুন।
৪. সুলতানি রাষ্ট্র ও সমাজ বিবর্তনের ধারা আলোচনা করুন।

—

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

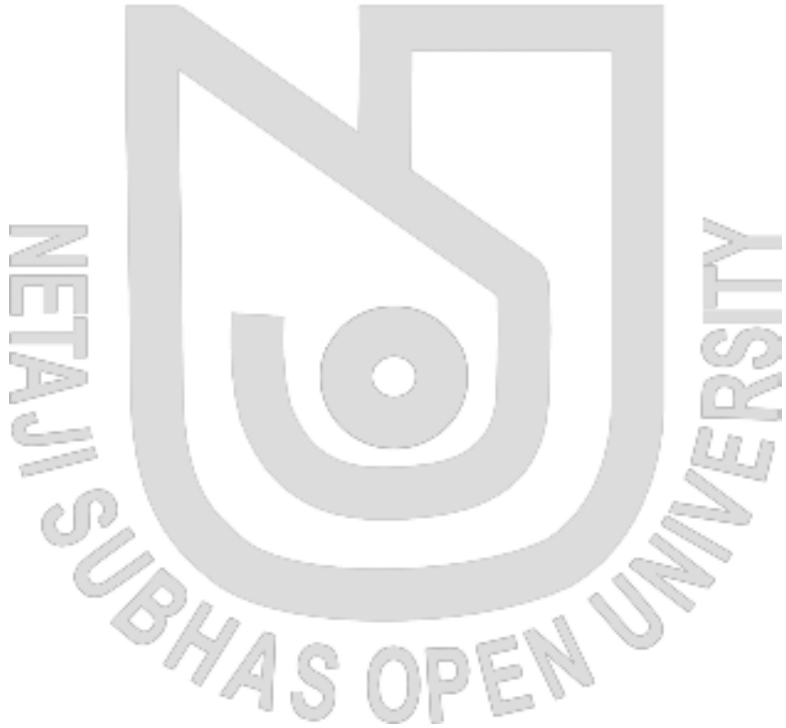
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY